নবম অধ্যায়

উপসংহার ঃ- কি পেলাম

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা স্বাধীনতা পরবর্তী কোচবিহারের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রসঙ্গে রাজ' শাসিত কোচবিহারের সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যর কথাও আলোচিত হয়েছে। আমাদের সমাজজীবনে কোন কিছুই পূর্বাপর সম্পর্ক বিহীন নয়। একদা কোচবিহার যা ইংরেজ করদমিত্র রাজ্য তার সাহিত্য ও সংস্কৃতি স্বাভাবিক ভাবেই পরবর্তীসময়কে প্রভাবিত করবে। এই ঐতিহ্য পরম্পরার আলোকেই আলোচিত হয়েছে স্বাধীনোত্তর কোচবিহারের সাহিত্যও সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির অভিধাটি খুবই ব্যাপক। মানুষের ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ জীবনে যা কিছু সৌন্দর্যমন্ডিত, যা কিছু তার অন্তরের ঐশ্বর্য্য, তার জীবনচর্যা এসবই সংস্কৃতির অর্ন্তভুক্ত। আমরা সংস্কৃতিকে অত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিনি। মূলতঃ এই সময়কার সাহিত্যসাধনা, শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গন, সাময়িক পত্রের অবদান, লোকসাহিত্যের প্রবহমান ধারা প্রভৃতি নিয়ে আমরা মালা গেঁথেছি। বক্ষ্যমান এই আলোচনায় আলোচিত হয়েছে বর্তমান কাল পর্যন্ত রচিত ২১৪ টি গ্রন্থ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলার এই প্রান্তিক জেলায় এপাওনা নিতান্ত কম নয়।

কাব্য কবিতার আলোচনায় ৪০ জন কবির ৮৪ টি কাব্যগ্রন্থ আলোচিত হয়েছে। এদের মধ্যে আবার ১২ জন কবি বিভিন্ন কবি যারা স্বাধীনোত্তর কোচবিহারে বিভিন্ন দশক থেকে কাব্যচর্চা শুরু করেছেন তারা অবশ্যই কাব্যর বিভিন্ন লক্ষণ বিচারে স্বাতন্ত্র্যর দাবী করতে পারেন। যেমন প্রত্যক্ষভাবে মানুষের জীবনের সমস্যা, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক যেসমস্যাগুলি দশকের পর দশক ধরে মানুষকে পীড়িত করে এসেছে সেগুলি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে অপরাজিতা গোপ্পী ও শৈবাল মজুমদারের কবিতায়। অপরাজিতা গোপ্পী ব্যক্তিজীবনে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত, তাই অধিকার প্রতিষ্ঠার যে কোন আন্দোলন শাসক শ্রেনীর যে কোন অবিচার তাকে ক্ষুব্ধ করে, এই সহজসরল অনুভূতিই তার কলমে কবিতা হয়ে ওঠে, যেমন 'কিবল্লে - রাজা হতে চাও ! কবিসাহিত্যিক ! / বেশতো ঢুকে পড়ো গ্রীনরুমে / বেলজিয়াম আয়নার সামনে দাড়িয়ে / ভাল করে মুখোশটা এঁটেনাও / তারপরগ্রীবা উচু করে / চোখবন্ধরেখে / চারিদিকে দারিদ্র্য পীড়িত মানুসগুলোকে / প্রত্যক্ষ করার ভঙ্গিতে / রিহার্সাল দাও' (পৃঃ- ১০- মুখোশবদলায় মাঝরাতে), শৈবাল মজুমদার প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথেযুক্ত না থাকলেও সত্তর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা যা গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসের এক ভয়াবহ কানাগলি দিয়ে পথ অতিক্রম করছিল, যেখানে প্রশাসন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজকরে, সেই নগ্নসত্য উদ্ভাসিত হয়েছে

'রাজপথ জুড়ে ওই
শুয়ে আছে ছোড়দার ছেঁড়ালাশখানা
রামে উপাসনাগৃহ, ডান পাশে'থানা
মাঝখানে চিৎ হয়ে
শুয়ে আছে ছোড়দার ছেঁড়া লাশখানা;

(পৃঃ- ৭-ছোড়দার ছেঁড়া লাশ)

এই কবিতায়।

তবে অপরাজিতা গোপ্পী ও শৈবাল মজুমদার কাব্যভাবনায় একই পথের পথিক হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল অপরাজিতা গোপ্পী ছন্দ ও ভাষায় বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা না করে সহজ সরল ভাষায় তারকথা বলার চেষ্টা করেছেন, সেখানে শৈবাল মজুমদার ভাষা ও ছন্দে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন, যেমন

'ঘুটেদেয় নাকি আলপনা আঁকে কাব্যময়ীর খেয়ালে
ঘুনপোকা তার উরুখেয়েগেছে দুই জানুচাটে শেয়ালে'
(পৃঃ- ১২- কবিতা এখন)

তবে এরই মাঝে প্রবোধ পাল একটু ভিন্ন পথের পথিক। তার মধ্যে সমকালীন সমাজচেতনা ও চেতনার অন্তর্লীন ভাব দুইয়েরই প্রতিফলন হয়েছে । যেমন 'জীবনের রাজপথে অবিচ্ছিন্ন জনতার ভীড় / উন্মুখজীবন নিয়ে খুঁজে ফিরি সকল হৃদয়' (পৃঃ- ১৬- জীবন সম্পর্কে) অথবা

'আমার চৈতন্যলীন বীনাটির আগ্নেয় ঝঙ্কার
তার
রূপ দিলো।

এখন ? এখন ?
এখন অনেক মুখে সেই মুখ, সেই চুমো
অগ্নিস্তোএ
সেই জ্বালা।'
(পৃঃ-২৪- দেয়ালা)

অলোক গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রদীপরায়গুপ্তের কবিতায় দেখা যায় বাকবৈদগ্ধ্যও বুদ্ধিদৃপ্ত মনন। যেমন'মনিদ্বীপা। নারঞ্জন, আলো তুমি জ্বেলোনা এখন:...

স্বভাবের সেরেস্তায় অনেক ঋণী, আজ কিছু
শোধদিয়ে পথটাসহজ বিস্তির্ণকরি, এসো।
(পৃঃ- ২৪- নাটাকাব্য 'সংলাপে সীমিত' অলোক গঙ্গোপাধ্যায়)

অথবা 'সকলেই নত হয়েছে প্রার্থনায়
অথচ তোর সুবিপুল জিভ জ্বলে উঠেছে তানসেনের
দীপক রাগিনী।,'
(পৃঃ- ৩৭-স্খলিত মুখ প্রদীপ রায়গুপ্ত)

কবি পরেশ সোম রোমান্টিক মন, চিত্রময়তা, ছন্দবন্ধতা বিচারে পাঠকের কাছেঅবশ্যই স্বতন্ত্র মনোযোগ দাবী করতে পারেন। যখন তিনি বলেন

'নাগর হয়ে ডুবদিয়েছি অথৈ জল
তবুযেন ভেজেনি মন বুকের তল;'
(পৃঃ- ১৫- দেখেছিনিযাদ এক)
অথবা
'বেলা সেনের আঁচল ভেবে যেই তাকাই
কলার পাতা হাওয়ায় নড়ে যাছেতাই।'
(পৃঃ- ১৫- দেখেছি বিষাদ এক)

স্বখন রোমান্টিক মনন, চিত্রময়তা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবে কবি রনজিৎ দেব, সমীর চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, কোচবিহারের কাব্যজগতে উল্লেখযোগ্য নাম। এদের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ সংখ্যাবিচারেই অধিক নয়, প্রকরণ বিচারেও স্বতন্ত্র। রোমান্টিক মন্ময়তা, চিএকল্প ছন্দবদ্ধতা, স্থানিক বৈশিষ্ট্যর প্রতিফলন ইত্যাদি তাদের কাব্যগ্রন্ধ অবশ্যই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে । যেমন

নির্জনতম সন্ধ্যার আকাশে উড়ছে কুলায় ফেরা পাখি
দিগন্ত এমন ভাবে মিলিয়ে যাচ্ছে আমার কাছে'
(পৃঃ- ২৬- শাখা প্রশাখা শেকরগুচ্ছ — রনজিৎ দেব)

অথবা 'ভালবাসাও দুঃখের আর্তনাদ
চিতার আগুনে লকলক করে উঠে
স্মশান বন্ধুরা আসে
একপাশে পড়ে থাকে ছেঁড়া কাঁথা
তেল চিটে বালিশ
(পৃঃ- ১২-ভালবাসা ছড়িয়ে রয়েছে তুলে নাও সমীর চট্টোপাধ্যায়)

অথবা 'যতক্ষন দেহে প্রাণ
ততক্ষনই ঝরে গল্প
ততক্ষনই রসরঙ্গ
ততক্ষনই সঙ্গভঙ্গ
(পৃঃ-৫-বিন্দুজন্ম — সন্তোষ সিংহ)

উপরোক্ত ছত্র গুলির মধ্যে যেমন রনজিৎ দেব, সমীর চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মন্ময়তা ও চিত্রময়তার প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি সন্তোষ সিংহের কবিতায় মন্ময়তা ও ছন্দবন্ধতার অভিব্যক্তি ঘটেছে। আবার রনজিৎ দেব, সমীর চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান নাম যেমন, চিলাপাতা ফরেষ্ট, জয়ন্তী, আইহো, বুলবুল চণ্ডী ইত্যাদি নাম উঠে এসেছে তেমনি সন্তোষ সিংহের কবিতায় প্রতিকলিত হয়েছে বৃষ্টি কামনায় রাজবংশীদের উপাস্য 'হুদুম দেও' দেবতার নাম। তবে এদের কারোর রচনায়ই সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক শুভাশুভের দিকটি প্রতিফলিত হয়নি। একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করলেও শুভাশিস চৌধুরী সম্পর্কেও এই মন্তব্যগুলি প্রযোগ্য।

কোচবিহারের স্বাধীনোত্তর কাব্যধারায় অরুনেশ ঘোষ অবশ্যই এক ব্যাতিক্রম । তার কবিতায় মন্ময়তার চাইতে প্রজ্ঞা বা বোধির প্রাধান্য পাঠককে আকৃষ্ট করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্বিচার যৌন শব্দের প্রয়োগ পাঠকমনে যে বিবমিষা আনে সে সত্যকেও অস্বিকার করা যায়না। বলা যায় পৃথিবী সম্পর্কে তার মধ্যে একটা নেতিবাদী ভাবনা কাজ করে যা অনেকটা বোদালেয়ারীয় বলা যায়। যেমন —

' কে করবে বীর্যদান আর কে করবে সন্তান প্রসব
কিন্তু কোন ভাবেই সেই বিপথিক - আমি কখনও ফিরবোনা।'
(পৃঃ-১০-বিপথিক)

কোচবিহারের কবিদের কাব্য প্রতিভার আলোচনায় বলা যায় তাদের সবার কবিপ্রতিভা কখনোই সমমানের নয়। সংখ্যা ও গুনমান বিচারে তাদের অনেকের কবিতা শুধু যে কোচবিহারের কাব্যর অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করছে তা নয়, সামগ্রিকভাবে তা বাংলা সাহিত্যের এক অচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

কোচবিহারের জীবনযাত্রা অনেকটাই গতানুগতিক ও নিস্তরঙ্গ । অথচ উপন্যাস তরঙ্গায়ত জীবনের শিল্পরূপ। জীবন সম্পর্কে গভীর অনুভূতি ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা না থাকলে খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক হয়ে উঠাসম্ভব নয়। এই কারনেই স্বাধীনতা পরবর্তী কোচবিহারে কথাসাহিত্যর অঙ্গনটি তেমন সমৃদ্ধ নয়। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম অমিয়ভূষণ মজুমদার। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে কাহিনী প্রধান, পারিবারিক তথা সামাজিক উপন্যাসের জগৎ টি বরং ছিল অধিকতর সমৃদ্ধ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কেউ কেউ স্থানীয় ইতিহাসকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখেছি যে এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি, কারন সেখানে ইতিহাস বিকৃত, গল্পাংশওকুণ্ঠিত।

'স্বাধীনোত্তর কথা সাহিত্য' পর্যায়ে ২২ জন কথা সাহিত্যিকের গল্পগ্রন্থ উপন্যাস আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে অমিয়ভূষণ মজুমদার, অশনিভূষণ মজুমদার, জীবন দে, প্রবোধ পাল, প্রদীপ রায়গুপ্ত, জাগরিতা মালাকার তাদের রচনার মান বা সমৃদ্ধির জন্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রথমেই অমিয়ভূষণ মজুমদারের কথা আলোচনা করতে গিয়ে একথা বলা সঙ্গত সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত অমিয় ভূষণ তার বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য, বিশিষ্ট গদ্যভঙ্গিমার জন্য সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যের একজন প্রতিস্পর্ধা সাহিত্যিক। বিশেষ করে উদ্বাস্তু সমস্যা তার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আঘাত করেছে। তাই দেখা যায় ১৯৪১ সালের ভারতবিভাগের আগেই সহস্র বছর পূর্বের ইহুদীদের দেশছাড়ার যন্ত্রণা তার নাটক 'দি গড অন মাউন্ট সিনাই' এ বাণিরূপ পেয়েছিল, তার কয়েকবছর পর ভারত বিভাগ তথা বঙ্গ বিভাজনান্তে উপমহাদেশে যে বাস্তুহারা 'নতুন ইহুদী' সম্প্রদায় সৃষ্টিহল তাদের প্রতি তার গভীর সহানুভূতিই প্রতিফলিত হল 'গড় শ্রী খণ্ড', 'নির্বাস' ও 'উদ্বাস্তু' উপন্যাসে। 'রাজনগর' উপন্যাসে এক নীরব ক্রান্তিলগ্ন ধ্বনিত হয়েছে। বলা যায় এই দুটি উপন্যাসেরই বক্তব্য দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে। মধুসাধুখাঁ লেখকের একমাত্র উপন্যাস যেখানে লেখকের পরিচিত কোচবিহার ও সংলগ্ন অঞ্চলের ইতিহাস যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। অমিয়ভূষণের সাহিত্য সম্পর্কে আর যে কথাটি বলা প্রয়োজন তা হল। তার লেখাতে গতিময়তা, যে গতিময়তা উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে তাই যেন অনুরণিত হয়েছে। তাই উরুণ্ডী গল্পে তাকে বলতে শোনা যায় 'যাত্রা থেকে ফিরে যাওয়া, তাকেই হার' মানা বলে। মরার চাইতেওহার। মরাটা হার নয়।' বস্তুত অনবদ্য ভাষা ভঙ্গী , বাস্তব ও কল্পনার অদ্ভুত মিশ্রণ অমিয়ভূষণের উপন্যাস ও ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য।

অন্যান্য গল্পকারদের মধ্যে জীবনদের নাম অমিয়ভূষনের পরই উচ্চারিত হতে পারে। তার 'অন্তরাল' 'লালগোলা প্যাসেঞ্জার'এর কিছু কিছু গল্প সত্যিই সুখপাঠ্য। জীবন দের বৈশিষ্ট্য হল তার গল্পে রাজবংশী বা কামরূপী উপভাষা এবং পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা সমানভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। জীবনদের অনেক গল্পেও পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের দুঃখ পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে কাজ করেছে। তাই তপতীর অনুভব 'প্রশস্ত পদ্মার বুকে সবইসমান। সবই আগের মত।' (পৃঃ-৩৫-লালগোলা প্যাসেঞ্জার) তাব এই স্বপ্নালুভাব শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্লাটফর্মে গিয়ে রূঢ় বাস্তবে প্রত্যাবর্তন করে। অন্যান্য কথা সাহিতিকদের মধ্যে প্রবোধপাল তার শঙ্খ হৃদয়উপন্যাসে যেমন ঔপন্যাসিক সুলভ রচনার জটিলতার জাল বুনেছেন তেমনি ঋতব্রতাভাষা ভঙ্গিমায় পাঠকের দরবারে নিজেকে উপস্থিত করেছেন, যেমন 'চমকে উঠেছিলুম। দরজা খুলতেই দেখি। দেখতেইত আমাকে। পেতেই হত ভয়।' (পৃঃ-শঙ্খ হৃদয়) তেমনি প্রদীপ রায়গুপ্তের গল্প সংকলন 'ঘরে ফেরার সময়' ও 'শ্রবনা নক্ষত্রের রাত্রি'র প্রতিটি গল্প ছোট গল্পের লক্ষণ বিচারে অর্থাৎ বিষয় বস্তুর অভিনবত্ব, মনবজীবনের কোন বিশেষ সমস্যার মহুর্তের উপর ক্ষণপ্রভাদান

ইত্যাদি বিচারে সার্থক ছোটগল্প বলা চলে। তবে এরই মাঝে 'পরিচয়' (পৃঃ-৯-ঘরে ফেরার সময়) 'প্রজাপতির আকাশ' (পৃঃ-৭৩-ঘরে ফেরার সময়) 'ফিরে এসো সুরঞ্জনা' (পৃঃ-১৪৮-শ্রবণানক্ষত্রের রাত্রি) বিশেষ উল্লেখের দাবী করতে পারে। অশনী ভূষণ মজুমদার তার অকাল প্রয়াগজনিত কারণে বেশি লিখতে পারেননি। 'বনশ্রী' নামেগল্পগ্রন্থ ও বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ছোটোগল্প বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। টুকরো টুকরো কথা কিকরে চিএময়তা তৈরী করতে পারে অশানিভূষণ তা দেখাতে পেরেছেন। যেমন 'ক্যানভাসখানা জুড়ে ধূসর রক্তিম পটভূমিকার উপরে নদীবক্ষে মাস্থলভাঙ্গা পাঁলছেঁড়া একখানা নৌকার উপর ভাঙ্গাহাল হাতে নেতিয়ে পড়েছে একটি লোক।' (পৃঃ-২৭-২৮-কুয়াশা উত্তরস্বর সাময়িকপত্র ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬) জাগরীতা মালা কারের প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'অনুভব ' এর অনেক গল্পেই খুবউচুঁ মানের নয়। কিন্তু 'সেন্টুদা চলেগেল' (পৃঃ-৫৭) ও আরোও দুএকটি গল্প অবশ্যই ভিন্নস্বাদের বলাই যথেষ্ঠ নয়। জাগরিতা মালাকার একজন সম্ভাবনাময়ী কথাসাহিত্যিক বলা চলে।

স্বাধীনতার পরবর্তী কোচবিহারে রচিত নাটক সংখ্যার বিচারে না হলেও গুনমানের বিচারে খানিকটা প্রশংসার দাবীরাখে। এমনিতেই শহর কলকাতা বাদে বাংলা নাটকের দৈন্যদশা লক্ষকরা যায়। প্রকৃত অর্থে নাটক সমস্ত নাট্যসাহিত্যেই কম। তবে অঞ্চলের গ্রুপ থিয়েটারগুলো যুগোপযোগী নাটক রচনায় ও প্রযোজনায় ব্যস্ত থেকেছে। অবশ্য একথা বলতেই হয় যে অত্যাধিক রাজনৈতিক সচেতনতা, যা অনেক সময় শ্লোগানে পর্যবসিত হয়েছে তাতে নাটক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে এই অঞ্চলে নাটক রচনার ঐতিহ্যসুপ্রাচীন । বর্তমানকালতার প্রয়োজনেই নাটকের বক্তব্য ও আঙ্গিককে নতুন খাতে প্রবাহিত করতে উদ্যোগী।

নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে দেখাযায় কোচবিহারে ১২০ টি প্রচলিত নাট্যদল আছে যারা ১৮৭০ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রসেনিয়াম থিয়েটার বা মঞ্চাভিনয় এবং সাম্প্রতিক কালে পথনাটকের অভিনয় করে মনোরঞ্জন ও চিত্তের জাগরন দুই ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এই সংস্থাগুলি ছাড়াও ভারতীয় গননাট্যসংঘ, কোচবিহার শাখা, গনতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, কোচবিহার শাখা বিভিন্ন যাত্রাদল ইত্যাদি সংস্থাগুলি রয়েছে যাদের নাট্যভিনয়ের একটি স্বতন্ত্রধারার সাথে দর্শকসাধারণ পরিচিত। তাছাড়া স্বাধীনোত্তর কোচবিহারের ১৪ জন নাট্যকারের গ্রন্থাকারে ও সাময়িক পত্রে বিভিন্ন নাটকের বৈশিষ্ট্যনিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত এই নাট্যকগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে অমিয়ভূষণ মজুমদারের নাটকের নাম উল্লেখযোগ্য। যদিও অমিয় ভূষণের এপর্যন্ত পাঁচটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে তবু শৈল্পিক উৎকর্ষবিচারে ১৯৪১ সালে 'মন্দিরা' পত্রিকায় প্রকাশিত নাটক 'দিগড অন মাউন্ট সিনাই' উল্লেখযোগ্য। মিশরের ফারাওয়ের রাজত্ব থেকে উদ্বাস্তু ইহুদীদের অনুভব পৃথিবীর যে কোন বাস্তুহারাদের দুঃখের এক অনবদ্য দলিল বলা চলে। তার সৃষ্ট নাদাব চরিত্রে অসহায় নিরালম্ব উদ্বাস্তু মানসিকতার আতংক যেন প্রতিফলিত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় রাজালক্ষণ সেনের রাজত্বের অন্তিম লগ্নের উপর রচিত 'মহাসত্ত' নাটকটিতে নাটকীয় দ্বন্দ কম থাকলেও সংলাপ ও পরিবেশনার অভিনবত্বে মনোজ্ঞ নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে। অরুনেশ ঘোষের নাটক 'বর্বরের তীর্থ যাত্রা' বক্তব্য বিষয়ের গভীরতায় অনবদ্যহলেও ইডিপাস কমপ্লেক্সের পুনরাবর্তনে, অকারণ যৌন শব্দ প্রয়োগ নাটকটির মঞ্চনফলতার সম্ভাবনাকে প্রতিহত করেছে বলা যায়। কল্যাণময় দাসের নাটকে নাটকীয় দ্বন্দ, বিষয়বস্তু ও সংলাপ প্রয়োগ পদ্ধতির বৈচিত্র্য অবশ্যই প্রশংসনীয়।

যাইহোক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত নাটকগুলির নাট্যকার ও পরিচালকদের মধ্যে কোচবিহারের নাটকের যাত্রাকে যারা ক্রম অগ্রাসরমান করে তুলছেন তারা হলেন কল্যানময় দাস, অশোক ব্রহ্ম,দীপায়ণ ভট্টাচার্য্য; কিশোর নাথ চক্রবর্তী, ইন্দুভূষণ ভদ্র, পূর্বাচল দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

প্রবন্ধের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করাযায় স্বাধীনতাপূর্ব যুগের প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তুর সাথে যদিও জনজীবনের সম্পৃক্তি ছিলনা, তবু বিষয়বস্তুর ভাবগাম্ভির্য্যে, স্বাধীনোত্তর প্রবন্ধের তুলনায় ঐগুলি সমৃদ্ধতর ছিল। স্বাধীনতা পূর্বযুগের প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে ঐতিহাসিক , দার্শনিক, প্রবন্ধগুলি অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদের কোচবিহারের ইতিহাস, উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম। শরৎচন্দ্র ঘোষালের বেদান্ত পরিভাষা, মিমাংসা পরিভাষা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালের প্রবন্ধগুলি সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, নৃতাত্বিক ইত্যাদি বিষয় বৈচিত্র্যে ভরপুর। যেমন আশুতোষ নাথ রায়ের 'ঈশ্বর চিন্তার বিবর্তন', অরুন মৈত্রর 'সিকিমের আদিবাসী লেপচা, রনজিৎ দেবের 'উত্তরবাংলার চিঠি (১ম খণ্ড), মনীন্দ্রলাল কুণ্ডুর তুলনামূলক বঙ্গীয় রাজবংশী বাঁধাঁ, শচীনন্দন ঘোষালের 'পল্লী উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ, হিমাদ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও সুধীশঙ্কর ভট্টাচার্যর 'কোচবিহারের প্রাচীন ব্রতকথা' হরিশচন্দ্র পালের 'উত্তরবঙ্গের মেয়েলী ব্রতকথা', সুখবিলাস বর্মা জাগগান, দিগ্বিজয় দে সরকারের আক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণবেতর বাংলা কাব্যেবৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব, লোকায়ত দর্পনে উত্তরবঙ্গ উল্লেখযোগ্য। বলা চলে স্বাধীনোত্তর কোচবিহারের প্রবন্ধের আঙ্গিনা বিষয় বৈচিত্র্য, অভিজ্ঞতার আলোকে সমৃদ্ধ। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় যে সব সাময়িক পত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে তাদের মধ্যে কোচবিহার সাহিত্য সভা

পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। এই সব পত্র পত্রিকা সীমিত পরিসরে হলেও এই জেলায় একটা সাহিত্যিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। এছারাও কিছু কিছু পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ের দ্বারা সমৃদ্ধ।

পরিশেষে বলা যায় আজকের বাংলার সাহিত্য সাধনা, শিক্ষাসংস্কৃতি কলকাতাকেন্দ্রীক। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে মফঃস্বল শহরগুলোর একটা স্বাতন্ত্র্য এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যেত । বিশেষ করে কোচবিহারের রাজণ্য শাসিত অঞ্চলে সাহিত্য সংস্কৃতির একটা ভিন্নধর্মী বাতারণ ছিল। সেই ঐতিহ্য কতটা জনমুখী সে বিচার বিশ্লেষণ ও শুরু হয়েছে। কোচবিহার রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্রে উত্তরনের পাঁচদশক অতিক্রম করেছে। এই সময়ের সবচাইতে বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনা জনজীবনে জনমানসে ব্যাপক পরিবর্তন। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুহারা মানুষের স্রোত বন্যার মতই এই অঞ্চলকে প্লাবিত করেছে। জেগেউঠেছে নতুন কোচবিহার। জেলার শষ্যক্ষেত্র হয়েছে সুপ্রসবিনী, সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গন কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে জনগনেশের অংশ গ্রহণে। সাহিত্য সংস্কৃতি গনমুখীহয়েছে, সমৃদ্ধতর হয়েছে। এযেন পূর্ববর্তী ঐতিহ্যেরই নবরূপায়ন। তবেএকথা অস্বিকার করা যাবেনা যে মফস্বল জেলা গুলিতে সাহিত্য সংস্কৃতির আবহাওয়া এখনও পালে হাওয়া পায়নি। এর নানা আর্থসামাজিক কারণ থাকতে পারে। এতদসত্বেও এই পাঁচদশকের পথ পরিক্রমা বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতিকেই সমৃদ্ধ করেছে। এমনি করেই কালের নীরিখে আমাদের পথ চলা, সাহিত্য সংস্কৃতির পরম্পরায় বেঁচে থাকার তাৎপর্য।